

ইয়াকভ দলুগলেনস্কি

ঘড়ির বিষয়ে নানাকথা



ইয়াকভ
দ্‌লুগলেনস্কি



ঘড়ির বিষয়ে নানাকথা



'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো



ধাঁধা

প্রথম অধ্যায়

ধাঁধা ভালোবাসে সবাই। আর তুমিও বোধ হয় ভালোবাস, তাই না?

তাই এসো, প্রথমেই আমি তোমাদের জন্য দুটো ধাঁধা দিতে চাই।

প্রথমটা অনেকদিনের পুরনো, আর দ্বিতীয়টা ভেবে বার করেছি আমি নিজে।

বলো তো দেখি: কে সব সময়েই চলছে, অথচ জায়গা থেকে নড়ছে না এক পা'ও? ঘরে যখন একেবারেই চুপচাপ, তখন কে বেশ জোরে জোরে বলে 'টিক-টাক', 'টিক-টাক'? কী হল, উত্তর তৈরি?

না হলে উল্টাও পাতা আর দেখতে পাবে তাতে আঁকা আছে এর উত্তর।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। একেবারে ঠিক। উত্তর হল: ঘড়ি।

এবার এসো, ঠিক একই রকমের ঘড়ি বানানোর চেষ্টা করা যাক। এ কাজে তোমায় সাহায্য করবেন মা অথবা বাবা, দাদু অথবা দিদিমা। বানিয়েছ?

আর এখন আমাদের এই সুন্দর ঘড়িগুলো কিছুক্ষণের জন্য পাশে সরিয়ে রেখে অন্য একটা ব্যাপারে কথা বলা যাক। তা হল: সময় জানা যায় কীভাবে।

সময় জানার দুটো উপায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

সময় জানার বহু উপায় আছে। তার দুটো সম্বন্ধে এখানে বলব।

আমি ছোট এক ছেলেকে চিনি, যে 'ক'টা বেজেছে?' এই প্রশ্নটি শুনে সব সময়েই তার দিদিমার কাছে ছুটে যেত আর দিদিমাও তাঁর ঘড়ি দেখে একেবারে ঠিকঠাক উত্তর দিতেন: 'দুটো বেজেছে' অথবা 'তিনটে'। অর্থাৎ ঘড়িতে যা বাজত ঠিক তাই বলতেন। এ হল প্রথম উপায়।

আমি অন্য একটি ছেলেকেও চিনি, যে নিজেই এলার্ম-ঘড়ির দিকে এগিয়ে যেত, অনেকক্ষণ ধরে তার দিকে তাকিয়ে থাকত আর নিজেই একেবারে সঠিকভাবে বলতে পারত ক'টা বেজেছে।

এবার এসো, এই দ্বিতীয় উপায়টা তোমাদের শেখানোর চেষ্টা করা যাক।

তবে এটা শেখার আগে একটা ব্যাপার তোমাদের মনে রাখতে হবে: সময়কে কয়েকটা বড় আর ছোট ভাগে ভাগ করা হয়; এ ব্যাপারটা লোকে ঠিক করে বহু বহু দিন আগে।

তবে তারা শুধু ঠিক করেই ক্ষান্ত হয় নি, সঙ্গে সঙ্গে তার নামও ঠিক করেছিল:

সবচেয়ে বড় ভাগের নাম দিয়েছিল 'ঘণ্টা',

মাঝারি ভাগের নাম হল 'মিনিট',

আর সবচেয়ে ছোট ভাগের নাম দেওয়া হল 'সেকেণ্ড'।



ক'টা বাজে ?

তৃতীয় অধ্যায়

এবার তোমাদের ওই পিচবোর্ডের সুন্দর ঘড়িগুলো নেওয়া যাক। ভালো ক'রে চেয়ে দেখ: তোমাদের এই ঘড়িগুলো প্রায় একেবারে আসল ঘড়িরই মতন:

গোল একটা চাকতি — তাতে ছোট-ছোট সংখ্যার চিহ্ন সহ এক থেকে বারো পর্যন্ত সংখ্যা আঁকা আছে; আছে দুটো কাঁটাও — বড় আর ছোট। আর এই কাঁটাগুলো ঘোরাবার জন্য যে যন্ত্রপাতির দরকার, নেই কেবল সেগুলোই।

তবে এসো, এ সব যন্ত্রপাতি ছাড়াই ঘড়ি চালানোর চেষ্টা করা যাক।

ছোট আর বড় কাঁটা দুটোকে একই সঙ্গে ঠিক '১২'-টার ওপর রাখা যাক। এর মানে কি জানো? এর মানে হল এখন ঠিক বারোটা বাজে।

আর এবার বড় কাঁটাটাকে বারোটার ওপর রেখে, অর্থাৎ সেটাকে না ঘুরিয়ে, কেবল ছোট কাঁটাটাকে ঘোরানো যাক।

ছোট কাঁটাটাকে '১'-এর ওপর রাখা যাক। তাহলে এখন ক'টা বাজে জানো? আমাদের ঘড়িতে এখন বাজে ঠিক একটা।

আর এখন যদি ছোট কাঁটাটাকে '২'-এর ওপর রাখা যায়, তাহলে ক'টা বাজবে? তাহলে বাজবে দুটো।

প্রত্যেক বার যখন ছোট কাঁটাটার সুঁচালো অগ্রভাগটিকে ঘড়ির সংখ্যা-আঁকা চাকতির কোন এক সংখ্যার ওপর রাখা হবে, আর বড় কাঁটাকে না নাড়িয়ে তখন কিন্তু সব সময়েই ঠিক '১২'-এর ওপর রাখা হবে, তুমি 'ক'টা বাজে?' — মায়ের এই প্রশ্নের একেবারে সঠিক উত্তর দিতে পারবে।

পরীক্ষার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ছোট কাঁটা আছে '৫'-এর ওপর, বড় কাঁটা '১২'-এর ওপর। তাহলে এখন ক'টা বাজে বলো তো? উত্তর: পাঁচটা।

আর এখন বড় কাঁটাটাকে '৬'-এর ওপর রাখো এবং ওখান থেকে ওটাকে একদম নড়িও না। এবার আমরা ঘোরাবো শুধু ছোট কাঁটাটাকে।

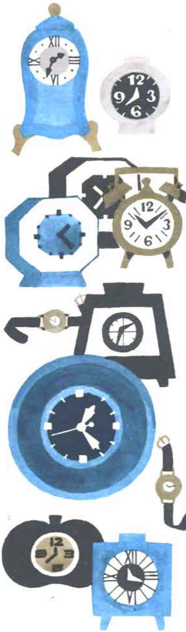
ছোট কাঁটাটাকে '১২' ও '১'-এর মাঝখানে রাখো। রেখেছ? তাহলে এখন বাজে সাড়ে বারোটা। এবার ছোট কাঁটাটাকে ঘুরিয়ে '১' ও '২'-এর মাঝখানে রাখো। ঘুরিয়েছ? ঘড়িতে এখন বাজে দেড়টা।

মনে রেখো: বড় কাঁটাটাকে যদি '৬'-এর ওপর রাখা হয়, আর ছোট কাঁটাটা যদি দুটো সংখ্যার মাঝখানে দাঁড়ায়, তাহলে তুমি বলতে পার: এখন বাজে সাড়ে বারোটা (অথবা সাড়ে চারটে অথবা সাড়ে ন'টা) — অর্থাৎ ক'টা বাজে তা নির্ভর করবে কোন্ দুটো সংখ্যার মাঝখানে ছোট কাঁটাটা তখন আছে তার ওপর।

পরীক্ষার জন্য একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বড় কাঁটাটা আছে '৬'-এর ওপর, ছোট কাঁটাটা '১১' ও '১২'-এর মধ্যে। তাহলে বলো তো এখন ক'টা বাজে?

উত্তর: সাড়ে এগারোটা। আর তুমিও কি ঠিক তাই ভেবেছ? এর মানে, ঘড়ি দেখা তুমি প্রায় শিখে ফেলেছ।





মোরগ, সামোভার ও বিখ্যাত এক এলার্ম-ঘড়ি সম্বন্ধে দু'চার কথা

চতুর্থ অধ্যায়

তোমার চোখের সামনে এক গাদা ঘড়ির ছবি, যেগুলো মানুষকে সময় জানতে সাহায্য করত এবং এখনও করছে।

এ ধরনের ঘড়ি থাকে উড়োজাহাজে। আর এটা থাকে মহাকাশযানে।

এটা হল খেলাধুলার জন্য প্রয়োজনীয় স্টপ ওয়াচ। আর এ হল দাবাখেলার ঘড়ি।

আর এটা হল আমাদের সেই বিখ্যাত এলার্ম-ঘড়ি। আর এটা হল জাহাজের ক্রোনোমিটার।

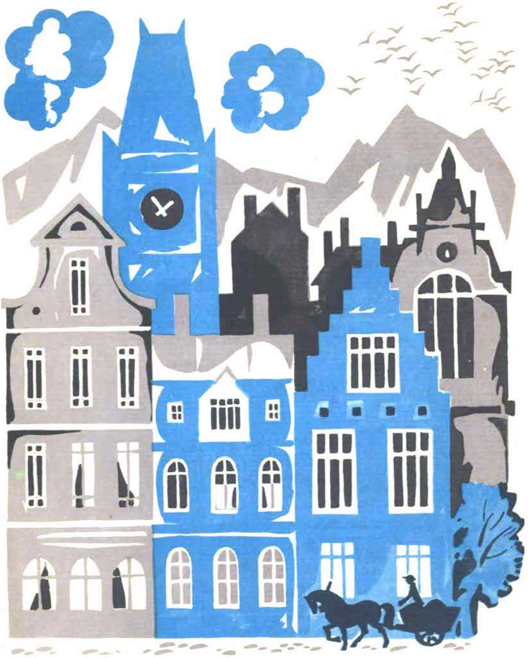
এর কয়েকটা সম্পর্কে আমি এখন বিশদভাবে বলব। তবে তার আগেই তুমি যে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাও, তা আমি তোমার হাবভাব দেখেই আঁচ করতে পারছি: 'এই সমস্ত ঘড়ির মাঝে শিল্পী মোরগ আর সামোভারের* ছবি কেন এঁকেছেন?'

এঁকেছেন, কারণ মোরগও এক ধরনের ঘড়ি বটে। তবে তা হল জীবন্ত ও বিশেষ ধরনের ঘড়ি। আগেকার দিনে ঘড়ি ছিল না, তখন মোরগই আমাদের সময় ঠিক করতে সাহায্য করত।

সকালে মোরগ যখন 'কোকড়-কো' বলে ডেকে ওঠে, আমাদেরও বিছানা ছেড়ে ওঠার সময় হয়। সন্ধ্যায় যখন সে কড়িকাঠের ওপর ঘুমানোর আয়োজন করে (মোরগরা সাধারণত কড়িকাঠের ওপর পায়ে ভর দিয়ে শুতে ভালোবাসে), তার মানে হল আমাদেরও শোয়ার সময় হয়েছে।

তবে সত্যি বলতে কি, মোরগ-ঘড়ি কিন্তু খুব একটা নির্ভরযোগ্য ছিল না। ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ সে হয়তো কড়িকাঠের ওপর থেকে পড়ে

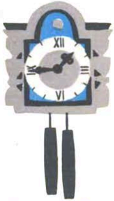
* সামোভার — চায়ের জল ফুটানোর পাত্রবিশেষ। — অনুঃ





গেল, সঙ্গে সঙ্গে মাঝরাত্তিরে প্রাণখুলে দিল ডাক — 'কোকড়-কো'। আবার এমনও হতে পারে — শেয়াল এসে মোরগকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে জ্যান্ত খেয়ে ফেলল।

আর ঠিক এই কারণেই এখানে সামোভারের ছবি আঁকা হয়েছে। এই সামোভারটা হল জল-ঘড়ি। এক বালতি জল নিয়ে সামোভারে ঢালা হল। আর তারপর তার পাইপের মুখটা খুলে দেওয়া হল। একটা কথা সবারই জানা ছিল: সামোভার থেকে এক বালতি জল পড়তে মোট সময় লাগে এক ঘণ্টা। সবটা জল যখন পড়ে গেল, তখন কাটল এক ঘণ্টা। তার মানে আবার তাতে জল ঢালা চলে। এই ভাবেই সারাদিন ধরে সামোভারে জল ঢালা হত।



এ ঘড়িটা হল বহু প্রাচীন। আমরাও হয়তো বা এই ঘড়ি দিয়েই কাজ চালাতাম, যদি না আজ থেকে আটশো বছর আগে মানুষ ভেবেচিন্তে অবশেষে আজকের ধরনের ঘড়ি আবিষ্কার করত: যে-ঘড়িতে আছে সংখ্যা-চাকতির ওপর বিভিন্ন সংখ্যা, কাঁটা ও যন্ত্রপাতি।



এই হল আমাদের ঘড়ির পূর্ব-ইতিহাস। দশ জনে মিলেও তা তোলা যেত না।

এই ঘড়িগুলো সাধারণত থাকত শহরের একেবারে মধ্যিখানে — বহু উঁচু কোন এক মিনারে। আর সে জন্যই এগুলোর নাম হয়েছিল মিনার-ঘড়ি। এই ঘড়িগুলোই ছিল শহরের প্রধান ঘড়ি।

বলাই বাহুল্য, এ ঘড়িকে ঘরে রাখা চলে না, — জায়গা হবে না। তাই ঘরে রাখা চলে এমন ধরনের ঘড়ি তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। আর ঠিক এ থেকেই ঘরের কপাল ফিরল। তার জন্য চমৎকার এক ঘড়ি ভেবে বার করা হল:

ফায়ার প্লেসের ঘড়ি — তা চিরকালের জন্য জায়গা করে নিল ফায়ার প্লেসের গায়ে;

দেওয়াল ঘড়ি — এর ব্যাপারে অবশ্য কোন ঝামেলা ছিল না: তা সরাসরি দেওয়ালে ঝোলানো হত;

মেঝে-ঘড়ি — নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে: এ ঘড়ি স্থাপিত হত মেঝেতে;

এবং অবশেষে টেবিল-ঘড়ি: এ ধরনের ঘড়ি রাখা হত লেখার





টেবিলের উপরে।

আর যাদের বাড়িতে বসে থাকতে মন যেত না তাদের জন্য ঘড়ি-নির্মাতারা তৈরি করল ছোট ধরনের ঘড়ি: পকেটে রাখার উপযুক্ত পকেট-ঘড়ি, আর হাতে পরার জন্য হাত-ঘড়ি। ঘড়ি-নির্মাতারা কিন্তু ঘুমকাতুরে, অর্থাৎ ঘুমতে যারা খুবই ভালোবাসে তাদের কথাও ভুলে যায় নি। তাদের জন্যও তারা তৈরি করল এক উপহার — এলার্ম-ঘড়ি।

এলার্ম-ঘড়ি কেন ভালো, তা নিশ্চয়ই তোমরা জানো। ঘণ্টা-বাজার চাবিতে দম দাও, তারপর তোমার যখন ঘুম থেকে ওঠার দরকার ঠিক সেই সময়ের ওপর ঘণ্টা-বাজার কাঁটাটাকে রাখো আর তারপর নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়ো। ঠিক সেই সময়ে তোমার কানের কাছে বেজে উঠবে 'ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং' (আজকালকার ঘড়িতে অবশ্য সুন্দর আর মিষ্টি আওয়াজও হয়) আর তুমিও প্রফুল্ল মনে বিছানা ছেড়ে উঠবে।

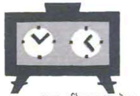
আগেকার দিনে লোকে সম্ভবত নাক ডাকিয়ে খুব গভীরভাবে ঘুমাত। তাই সাধারণ ধরনের 'ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং' আওয়াজে তাদের ঘুম ঠিক মতো ভাঙ্গত না। ঠিক সে কারণেই আগেকার দিনে নানা রকমের ঘড়ি তাদের সাহায্য করত:

কামান-ঘড়ি: এলার্ম-ঘড়ির সঙ্গে সংযুক্ত একটা কামানে ঠেসে বারুদ ভরা হত আর যথা সময়ে ঘুমন্ত ব্যক্তির কানের কাছে সেই কামানটি গর্জে উঠত;

দোলন-ঘড়ি: জটিল সব যন্ত্রপাতিযুক্ত এই ঘড়ি খাটের সঙ্গে বাঁধা থাকত। যখন ওঠা দরকার, ঠিক সেই সময়ে খাট হাঁটা-চলা শুরু করত, আর নড়িয়ে-চড়িয়ে লোককে খাট থেকে ফেলে দেবার জোগাড় করত। যেহেতু এই অবস্থায় কোন মতেই







ঘুমানো চলে না, অগত্যা বিছানা ছেড়ে উঠতেই হত।

এই ধরনের এলার্ম-ঘড়ি তৈরি করা হত পুরুষদের জন্য। আর নরম স্বভাবের ও কমজোর মেয়ে মানুষের জন্য অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী এলার্ম-ঘড়ি তৈরি করা হত।

যেমন: এমন এক ধরনের এলার্ম-ঘড়ি, যা ধরা যাক, ঠিক বারোটার সময় তাদের গায়ে সেণ্ট অথবা লেমনেড ছিটাতে শুরু করত।

মেয়েদের এই ধরনের এলার্ম-ঘড়ির পাশেই আঁকা আছে সমুদ্র-যাত্রার উপযোগী ক্রোনোমিটারের ছবি। এ ধরনের ঘড়ি ছাড়া কোন জাহাজই সমুদ্র যাত্রা করবে না। কারণ আমাদের সাধারণ ঘড়ি সমুদ্রে চলে না: জাহাজের দোলন তা সহ্য করতে পারে না, তাই খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়।

আগেকার দিনে যখন সমুদ্র যাত্রার উপযোগী ক্রোনোমিটার ছিল না, তখন জাহাজের ক্যাপ্টেনরা প্রায়ই সমুদ্রের বুকে পথ হারিয়ে ফেলত, চড়ায় আটকে যেত, নির্দিষ্ট বন্দরে পেঁছিতে অনেক দেরি হত। তাই সকলেই অবশ্য বিশেষ ধরনের ক্রোনোমিটারের স্বপ্ন দেখত, যা একেবারে সঠিক সময় দেখাতে পারবে।

স্পেন দেশের রাজা, যিনি নিজেকে সমুদ্রযাত্রীদের পৃষ্ঠপোষক বলে মনে করতেন, ঘোষণা করলেন যে এই ধরনের ক্রোনোমিটার আবিষ্কার করবে তাকে বিরাট পুরস্কার দেওয়া হবে। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টও তা-ই করল।



অবশেষে এক ব্যক্তি সেই ক্রোনোমিটার আবিষ্কার করলেন। তাঁর নাম ছিল জন হ্যারিসন। বিলেতের অ্যাডমিরালদের দরবারে এসে তিনি তাঁর ক্রোনোমিটারটি টেবিলের উপরে রাখলেন।

— এটা আবার কী? — জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরালরা।

— ঘড়ি। ক্রোনোমিটার, যার স্বপ্ন দেখছে দেশ-বিদেশের সব ক্যাপ্টেনরা।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজনীয় সব রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হল: যে-জাহাজেই হ্যারিসনের ক্রোনোমিটার থাকত তা আর কখনই পথ হারাত না আর একেবারে ঠিক সময়ে বন্দরে পেঁছিত।

ক্রোনোমিটারের ঠিক পাশে আঁকা আছে দাবা ঘড়ির ছবি। দাবা খেলার ঘড়ির বয়স ইতিমধ্যে একশো বছর পূর্ণ হল।

আগে কেমন হত? কোন এক দাবা-চালের ওপর একজন ভাবত দশ মিনিট, আর অন্য জন ভীষণ চালাক, সে ভাবত সারাদিন ধরে। প্রতিপক্ষকে একেবারে কোণঠাসা করতে চায়। তাকে বলা হত:



— তাড়াতাড়ি করো হে গ্র্যান্ডমাস্টার!

আর সে উত্তর দিত:

— আমি কি আর ইচ্ছে করে বসে আছি। ভাবতে তো সময় লাগে।

আজকাল প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে। তা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দাবা ঘড়িতে বিশেষ ধরনের একটা লাল পতাকা পড়ে যায়: গ্র্যান্ডমাস্টার, তোমার সময় শেষ, তুমি হেরে গেলে!

যে-সমস্ত ঘড়ির কথা আমি এতক্ষণ বললাম, তার সবগুলোই আজও মানুষের সেবা করে চলেছে। তবে এ কথা জানাই আছে যে, মাঝেমধ্যে ঘড়ি মেরামত করতে হয়, কখনও-সখনও কিছু যন্ত্রপাতিও বদলাতে হয়। আজকাল দরকার না থাকায় কামান-ঘড়ি, সামোভার ঘড়ি এবং লেমনেড-ছিটানো এলার্ম-ঘড়ি আর ব্যবহার করা হয় না।

এখন তুমি যখন নানা ধরনের ঘড়ি সম্বন্ধে প্রায় সবকিছুই জানো আর ঘড়িতে কীভাবে সময় দেখতে হয় তাও যখন শিখে নিয়েছ, তখন তোমায় আমি জিজ্ঞেস করতে চাই... বলতে পার...

...ঘড়ির ভেতরে আছেটা কী?

পঞ্চম অধ্যায়

মনে হয়, এ প্রশ্নটা তোমার মনে বহুবারই এসেছে।

সত্যিই তো, ঘড়ির ভেতরে আছেটা কী? ঘড়ির এই বাক্সটার মধ্যে বসে কে-ই বা সারাক্ষণ সারা ঘর জুড়ে (অবশ্যই ঘরে যদি হৈ-হট্টগোল না থেকে) বলে চলেছে: 'টিক্-টাক্, টিক্-টাক্'?

যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন আমি একদিন দাদুর কাছে গিয়ে সবকিছু একেবারে





ভালোভাবে জানতে চাইলাম। বেশ বড় একটি পকেট-ঘড়ি ছিল দাদুর। মাঝেমধ্যে দাদু সেটা আমায় ধরতে দিতেন। ও ধরনের ঘড়ি আমাদের বাড়িতে আর দুটি ছিল না। একটুও সময় নষ্ট না করে আমি সেটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভালোভাবে দেখতাম। একদিন আমি ঘড়ির ওপরের কাঁচটা খুললাম, তারপর কাঁটাগুলো নাড়তে-চাড়তে গিয়ে সেগুলো ভেঙ্গে ফেললাম।

আশ্চর্যের বিষয় ঘড়ি কিন্তু তখনও টিক্-টাক্ শব্দ করছিল।

যেহেতু সংখ্যা-লেখা চাকতি থেকে আমি কিছুই জানতে পারলাম না, তাই আমি ঘড়িটার পেছন দিকটা নিয়ে পড়লাম। পেছনের ঢাকনাটা খুললাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেলাম, কে করছিল সেই টিক্-টাক্ আওয়াজ — কী সুন্দর আর বিস্ময়কর ঘড়ির কলকব্জা।

এ ঘটনার পর দাদু আমার সঙ্গে বহু দিন কথা বলেন নি। দাদু যখন যুবক ছিলেন, তখন তাঁকে সাহসিকতার জন্য এ ঘড়িটা পুরস্কার দেওয়া হয়।

কোন মেরামতকারীই দাদুর ঘড়িটা মেরামত করতে রাজী হল না।

দিনকাল এখন অন্য রকম। ঘড়ির ভেতরে কে অমন ভাবে টিক্-টাক্ আওয়াজ করছে তা জানার জন্য এখন আর কারও দাদুর ঘড়ি ভাঙ্গার দরকার নেই: ছোটদের খেলনার যেকোন দোকানেই এখন সুন্দর সুন্দর সব বাক্স বিক্রি হয়, যার ওপরে লেখা থাকে 'খুদে ঘড়ি-নির্মাতা'। যেকোন কিশোরই — যদি অবশ্য সে ঘড়ি-নির্মাতা হতে চায় আর সবকিছু জানতে চায় — আজ এই বাক্স কিনতে পারে এবং অসংখ্য কলকব্জা দিয়ে সে নিজের হাতে সত্যিকার ঘড়ি তৈরি করতে পারে; আর এ ঘড়ি অন্য যেকোন ঘড়ির চেয়ে মন্দভাবে টিক্-টাক্ আওয়াজ করবে না আর সময়ও দেখাবে একেবারে সঠিক।

রাঘব বোয়াল আর হাতুড়ি সম্বন্ধে

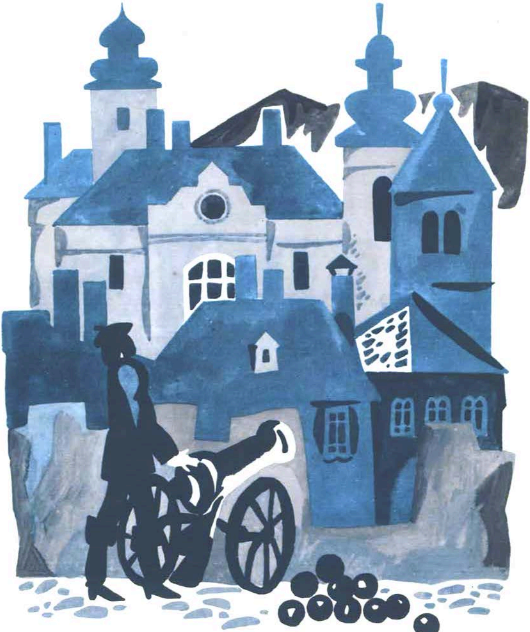
ষষ্ঠ অধ্যায়

তুমি যে-ঘড়িটা তৈরি করেছ, সেটা যে দেখবার মত হবে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই।

তবে একটি ব্যাপার মনে রাখবে: সেটাকে জোরে জোরে নাড়ানো, তাতে ধুলো আর জল ছিটানো চলবে না। তা করা চলে ঠিক তখনই, যখন তুমি জানো যে, তোমার ঘড়িটা:

ওয়াটারপ্রুফ,
ধুলো তার কোন ক্ষতি করতে পারে না,
আর তা খারাপ হয় না জোর ঝাঁকুনিতেও।

এর মানে হল, ঘড়িটা হাত থেকে না খুলেও সাঁতার কাটা চলে; হাত থেকে না খুলে হাতুড়ির সাহায্যে পেরেক মারা চলে; ঘোড়ার গাড়িতে ঝাঁকুনি খেতে-





খেতে স্তেপ-ভূমির ওপর দিয়ে যাওয়া চলে, যেখানে সর্বদাই ধূলোর পাহাড় জমে থাকে। এটা প্রমাণ করার জন্য এখানে কয়েকটি উদাহরণ দিতে চাই।

লেনিনগ্রাদের এক সংবাদপত্রে একদিন এরূপ খবর বেরোয়:

'এক রাষ্ট্রীয় খামারের মিস্ত্রি ইভান কনোনেন্‌কো একদিন এক রাঘব বোয়াল ধরেন। মাছের পেটটা কেটে তাঁর চক্ষু তো একেবারে ছানাবড়া: পেটে রয়েছে এক ঘড়ি! মিস্ত্রি ঘড়িটাতে দম দিলেন — আর সেটা চলতেও শুরু করলেন। আজ চার বছর হল সেটা ঠিকমতো চলছে।' যেহেতু বোয়াল মাছ থাকে জলে, তাই বলা চলে যে ঘড়িটা ছিল সত্যিসত্যিই 'ওয়াটারপ্রুফ'।

আর অন্য এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এ খবর: 'পেশায় আমি মুচি। আমার কাজ হাতুড়ি আর পেরেক নিয়ে। কাজের সময় আমি কখনই হাত থেকে ঘড়ি খুলি না, যদিও প্রথম প্রথম আমি অবশ্য ভয় পেতাম। আজ আর এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই: শক্‌-প্রুফ ঘড়ি সত্যিসত্যিই ঝাঁকুনিকে ভয় পায় না। দশ বছর ধরে হাতুড়ি নিয়ে কাজ করছি, আর ঘড়ি চলছে ঠিকভাবেই।'

সংবাদপত্রের তৃতীয় ও সর্বশেষ কাহিনীটা হল এই রকমের:

'এ চিঠিটা আপনাদের লিখছে উদ্যানবিদ সিদরোভ, যে দু' বছর আগে তার ঘড়িটা হারিয়ে ফেলে। এ বছরে সেটা আমি খুঁজে পাই: এই দু' বছর ধরে সেটা বাগানের একটা গাছের নিচে পড়ে ছিল, ধুলো আর জলে মাখামাখি হয়েছে; তবে যেই না আমি তাতে দম দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সেটা চলতে শুরু করল! চমৎকার এই ধরনের ঘড়ি তৈরি করার জন্য আপনাদের কারখানাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই!'

এই রকমই হল আজকালকার ঘড়ি! আগেকার দিনের ঘড়ি মনে হয় এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারত না!



এক বৃদ্ধ এবং নাৎসি যুদ্ধজাহাজ

সপ্তম অধ্যায়

আর এখন ঘড়ি সম্বন্ধে একটাও কথা নয়। এখন বলব সেইসব লোকের কথা, যাঁদের সমগ্র জীবন ঘড়ির সঙ্গে জড়িত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আর শহরে মিনার-ঘড়ি আছে। নরওয়েতেও আছে। আর ঠিক এ রকমেরই একটি ঘড়ি সম্বন্ধে এখন বলব আশ্চর্যজনক এক কাহিনী।

নরওয়ের ছোট্ট এক শহরের মিনারে অতি পুরাতন একটি ঘড়ি ছিল। প্রতিদিন ঠিক বারোটার সময় ঘড়ি দেখাশোনাকারী এক বুড়ো মিনারটাতে উঠত আর পুরনো এক কামান থেকে গোলা ছুঁড়ত। আর শহরের সবাই ঘড়ির দিকে না তাকিয়েই বলতে পারত: সময় এখন বেলা বারোটা।

এক দিন সমগ্র নরওয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট সেই শহরটিও ফাশিস্ট সৈন্যরা দখল করে নিল। আর শহরের বন্দরে নোঙর ফেলল ফাশিস্টদের এক যুদ্ধজাহাজ।

লোকে বলে, রোজকার মত সেদিনও সেই বুড়ো বেলা ঠিক বারোটার সময় মিনারে ওঠে। তবে সেদিন সে কামানে ফাঁকা-আওয়াজ করার বদলে তাতে সত্যিসত্যিই পুরনো এক গোলা ভরে। কামানটি দিয়ে নাৎসি যুদ্ধজাহাজের দিকে তাক করে, ভুল যাতে না হয় সেভাবে ঠিকঠাক নিশানা করে, আর বেলা ঠিক বারোটায় দাগল কামান।

ঘটল এক অবাক কাণ্ড — গোলাটা গিয়ে পড়ল যুদ্ধজাহাজে রাখা অস্ত্রশস্ত্রের একেবারে মধ্যিখানে, আর যুদ্ধজাহাজটা খণ্ডখণ্ড হয়ে চলে গেল জলের তলে!

ফাশিস্টরা বুড়োকে খুঁজে পেল না — তাকে লুকিয়ে রেখে ছিল শহরবাসীরা। আর নরওয়ে যখন আবার স্বাধীন হল, বুড়োকে তখন সর্বোচ্চ সামরিক পুরস্কারে ভূষিত করা হল।

আরও এক ঘড়ি-দেখাশোনাকারীর কথা

অষ্টম অধ্যায়

ইভান ফেদোতোভ অবশ্য কোনদিন কামান দাগেন নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে 'লেনিনগ্রাদের প্রতিরক্ষার জন্য' এক সামরিক পদকে ভূষিত করা হয়েছিল।

পিতৃভূমির মহাযুদ্ধ যখন শুরু হয়, ইভান ফেদোতোভিচের তখন বেশ বয়স হয়েছে — প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তিনি লেনিনগ্রাদের এক ইনস্টিটিউটে ঘড়ি দেখাশোনার কাজ করছিলেন: প্রতিদিন তিনি ইনস্টিটিউটের মিনারে উঠতেন আর ঘড়িতে দম দিতেন — সীসের টুকরো ভর্তি ভীষণ ভারী একটি বালতি তিনি রোজই ওপরে টেনে তুলতেন।


60
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

ঘড়ি-দেখাশোনাকারী সেই বৃদ্ধকে শহর ছেড়ে, জার্মান ফাশিস্টদের বোমা, গোলাবারুদ আর ভয়ঙ্কর বুভুক্ষার হাত থেকে দূরে চলে যাবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি যেতে রাজি হলেন না।

অবরোধের সেই ন'শো দিনের একদিনও, এক মুহূর্তের জন্যও ফেদোতোভের ঘড়ি থেমে যায় নি। তা দেখে লেনিনগ্রাদবাসীরা সময় মিলিয়ে নিত। যুদ্ধে যাবার পথে সৈন্যরাও তার সঙ্গে সময় মেলাত।

প্রতিদিন সুউচ্চ সেই মিনারে ওঠা আর বার্ধক্য ও বুভুক্ষার ফলে দুর্বল হয়ে পড়া হাতদুটোর সাহায্যে ভারী সেই বালতিটা ওপরে টেনে তোলা যে বুড়োর পক্ষে কত কষ্টকর ছিল, সে কথা আজ শুধু কল্পনাই করা যায়।

লেনিনগ্রাদবাসীরা শত্রুর কাছে মাথা নত করে নি, সে কথা তুমি জানো। বিজয়ের দিন পর্যন্ত বৃদ্ধ ঘড়ি-দেখাশোনাকারীও বেঁচে ছিলেন।

সময় সম্পর্কে

নবম অধ্যায়

আর এবার তুমি যখন প্রায় পুরো বইটা পড়ে ফেলেছ, তোমায় আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই 'সময়' বলতে আমরা কী বুঝি? আমাদের এই বইয়ে আমরা সব সময়েই 'সময়' কথাটা ব্যবহার করছি।

'সে কী?' — তুমিও নিশ্চয় আশ্চর্য হয়ে গেছ। — 'সময় হল ঘড়ি, এলার্ম-ঘড়ি! এটা তো সবাই জানে!' জানে বটে, তবে তা একেবারে নয়।

কারণ খোদ এলার্ম-ঘড়ি কোনমতেই 'সময়' নয়, এলার্ম-ঘড়ি সময় দেখার একটা সাদামাঠা যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আর খোদ 'সময়কে' চোখে দেখা যায় না, তার কোন রঙ আর গন্ধও নেই, তাকে হাত দিয়ে ছোঁয়াও যায় না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকে অদৃশ্য বাতাসকে ওজন করতে শিখেছে আর অদৃশ্য সময়ের হিসেব রাখার জন্য দেখা ও ছোঁয়ার যোগ্য ঘড়িও তৈরি করেছে।

স্কুলছাত্র ভাসিয়া মাকারোনি আর সময়ের একাংশ সম্বন্ধে

দশম অধ্যায়

বইটা পড়ে একটা ব্যাপার তোমরা নিশ্চয়ই ভালোভাবেই বুঝেছ: আমাদের সময় বাঁচায় কেবল ঘড়ি নয়, ঘড়ি-নির্মাতা আর ঘড়ি-দেখাশোনাকারী লোকেরাও।

তবে আমরা যদি নিজেরাই নিজের সময় না বাঁচাই — তাহলে ঘড়ি, ঘড়ি-নির্মাতা আর ঘড়ি-দেখাশোনাকারীরা কোনমতেই আমাদের সাহায্য করতে পারবে না।

এসো, উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করা যাক।

একটি মিনিট — এটা কি বেশি, না কম?

কারও কাছে বেশি, আবার কারও কাছে কম। কেউ বা এ সময়ে কিছুই করতে পারে না, আবার কেউ বা কিছু-না-কিছু করে ফেলতে পারে।

দশ সেকেণ্ডে প্রখ্যাত সোভিয়েত রানার ভালেরি বর্‌জোভ একশ মিটার দৌড়ে অলিম্পিক স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন।

এক মিনিটে 'চপ' বানাবার মেশিন পঞ্চাশটা 'চপ' বানাতে পারে।

এক মিনিটে মাকারোনি বানাবার মেশিন পাঁচ কিলো মাকারোনি বানাতে পারে।

আর আট বছরের স্কুলছাত্র ভাসিয়া ইভানোভ এক মিনিটে কিছুই করে উঠতে পারে না। এমনকি করার চেষ্টাও করে না। বলে, এক মিনিট — ফুঃ, ওটা কি একটা সময় হলো।

'বন্ধুগণ,

সময় বাঁচাও!

সময়ের সদ্ব্যবহার কোরো!'





অনুবাদ: সুবীর মজুমদার

ছবি এ'কেছেন ভ্লাদিমির কুল্‌কোভ



Я. Длуголенский
ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ЧАСАХ?
На языке бенгали

Jakov Dlugolensky
Clocks and Watches
In Bengali

'রাদুগা' প্রকাশন
১৯৮৩

Д $\frac{4803010102-341}{031(01)-83}$ 273—83